Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501070 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

‘Ekalavya’: The struggle for life of the lower classes through the eyes of Harishankar Jaldas

‘একলব্য’: হরিশংকর জলদাসের দৃষ্টিতে নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রাম

Sudhamoy Mandal
Researcher
Bengali Department
Burdwan University

Received on: 19th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:

The idea of the ‘Subaltern’, which arose in the second half of the 20th century as a response to the elitist and biased interpretations of colonial Indian history, is one of the main contemporary conceptions of the postcolonial era. Antonio Gramsci, an Italian Marxist philosopher, coined the phrase in his ‘Prison Notebooks’. Later, in the 1980s, Ranajit Guha's efforts to translate ‘Subaltern’ into Bengali as ‘Nimnabarga’ helped the concept gain traction in Indian historiography and social sciences. His writings, particularly ‘Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India’ (1983), were crucial in the development of Subaltern Studies in India. This theoretical framework was subsequently refined by academics like Gayatri Chakravorty Spivak, Partha Chatterjee, Shahid Amin, Gautam Bhadra, Gyanendra Pandey, David Hardiman and others.

The term ‘subaltern’ describes socially, politically, and economically marginalised and downtrodden groups of people. Peasants, labourers, sharecroppers, members of the lower middle class, and other marginalised groups whose lives were moulded by exploitation and reliance were included in colonial India. In order to understand history and society from the viewpoint of the marginalised, subaltern theory pushed historians and critics to go beyond traditional elite-centred narratives.

This strategy has also grown in importance as a literary analysis technique, especially in Bengali literature. Indian literature, from Sanskrit writings to mediaeval Bengali works, has been criticised by writers and critics for primarily celebrating upper-class domination while neglecting and silencing lower-class characters. As a result, contemporary Bengali authors have made an effort to reimagine overlooked ‘Mahabharata’ characters and events from a modern, subaltern viewpoint. Harishankar Jaladas stands out among them. He highlights the misery of the subaltern classes and exposes the oppressive nature of upper-class control by depicting the agony, deprivation, and internal conflicts of marginalised people in his novel ‘Eklabya’.

Key Words:

Subaltern Studies, Antonio Gramsci, Ranajit Guha, Bengali Novel, Ekalavya, Mahabharata

© Santiniketan Sahityapath

মূল প্রবন্ধ

‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।’

‘মহাভারত’ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মহাকাব্য, যার মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বকালীন জীবনচিত্র ধরা আছে, ‘যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে’ অর্থাৎ কী ধর্মীয়, কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী অর্থনৈতিক, কী সাংস্কৃতিক — জীবনের প্রতিটা দিকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থের দীর্ঘ অবয়বে। মহামুনি ব্যাসদেব আঠারো সর্গে সকল ভারতবাসীকে আর কাশীরাম দাস আপামর বাঙালি পাঠকদের সেই অমৃতসমান কাহিনি পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সমুদ্রমন্থন কালে যেমন অমৃতের সঙ্গে বিষাক্ত গরল উত্থিত হয়েছিল, তেমনি এই পুণ্যবাণী সম্বলিত মহাকাব্যের মধ্যেও থেকে গেছে বেশকিছু গলদ। কালে কালে সমালোচকরা সোচ্চার হয়েছেন এই ত্রুটি-বিচ্যুতির গাঁটছড়া খুলতে। শুধুমাত্র সমালোচকরাই নন, বাঙালি কথাকাররাও ‘মহাভারত’এর উপেক্ষিত চরিত্র এবং উপকাহিনিগুলিকে উপজীব্য করে নতুনভাবে, আধুনিক চিন্তা-চেতনায় পরিমার্জিত করে পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। হরিশংকর জলদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ঔপন্যাসিক, যিনি ‘মহাভারত’এর একাধিক বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত চরিত্রের বয়ান, কাতরোক্তি, তাদের মানসিক টানাপোড়েন লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর উপন্যাসে — নিম্নবর্গীয় ধ্যান-ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে।

এখন নিম্নবর্গ চর্চার সূত্রপাত, ইতিহাস ও ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের একটি আধুনিক মতবাদ হলো ‘নিম্নবর্গ’ যা বিশ শতকের শেষার্ধে, বিশেষত ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাস চর্চার একপেশে পক্ষপাতীত্বের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছিল। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ ‘সাবঅলটার্ন’ (সমার্থক শব্দ ‘সাবর্ডিনেট’)। শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় মার্কসপন্থী ইতালীয় দার্শনিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামসির ‘কারাগারের নোটবই’ (‘Prison Notebooks’)এ। গ্রামসি যখন ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তির কর্ণধার মুসোলিনির কারাগারে বন্দি ছিলেন তখন অর্থাৎ ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সময়পর্বে বইটি রচিত হয়েছিল। মার্কসীয় দর্শনে ব্যাখ্যাত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি যে উৎপাদন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় ‘শাসক-শোষিত’ দ্ব্যণুক সম্পর্কের বৈপরীত্য, ‘সাবঅলটার্ন’ হলো সেই প্রক্রিয়ায় শ্রমজীবী শ্রেণি। গ্রামসি সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ‘প্রভুত্ব-অধীনতা’ সম্পর্কের অন্তর্গত একশ্রেণিকে ‘বুর্জোয়াসি’, ‘হেগেমনি’, ‘ডমিন্যান্ট’ বলেছেন, গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়াটি যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। অন্যদিকে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াটি যারা টিকিয়ে রাখে তারাই হলো ‘সাবঅলটার্ন’ বা ‘প্রলেতারিয়েত’। তবে শুধু শিল্পশ্রমিক অর্থেই নয়, গ্রামসির আলোচনায় ব্যাপকার্থে সমগ্র কৃষকশ্রেণিকেও ‘সাবলটার্ন’এর আওতায় ধরা হয়েছে। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রামসির ভাবনার দিকটি উত্থাপন করে বলেছেন: “একদিকে ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব ছিল, তার বিরুদ্ধে গ্রামশি বলে গেছেন ‘সাবঅলটার্ন’ কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা।”[১]

গ্রামসি কৃষকশ্রেণির দৈনন্দিন জীবনযাপনের দিকে নজর দিতে বলেছেন, কেননা যে-কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ‘শাসক-শাসিত’ সম্পর্ক হলো সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন মেরুর সম্পর্ক। ফলত স্বরূপগত, আচরণগত, চৈতন্যগত দিক থেকে এই পৃথক অথচ পরস্পর সাপেক্ষ সম্পর্কের মধ্যেও কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে কৃষকশ্রেণির, যা অধিকাংশই চাপা পড়ে যায় বুর্জোয়া শক্তির আধিপত্যের দম্ভে। কিন্তু তিনি কৃষকশ্রেণির চেতনাগত অস্তিত্বকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করার কথা বললেও তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। বিশ্লেষণের এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় ‘সাবঅলটার্ন’ চর্চার সম্ভাব্য বেশ কিছু ইঙ্গিত তিনি পরবর্তী সময়ের গবেষকদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

গ্রামসি প্রদত্ত সংকেতগুলির সূত্র ধরেই প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বিশ শতকের আটের দশকে ভারতবর্ষে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

© Santiniketan Sahityapath

চর্চার ধারায় 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। ভারতবর্ষে এই ধারার পথিকৃৎ ছিলেন রণজিৎ গুহ এবং তিনিই 'সাবঅলটার্ন'এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'নিম্নবর্গ'। ১৯৮২ সালে এ প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দেওয়া দুটি ভাষণ যা পরবর্তীকালে 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৩তে প্রকাশিত তাঁর 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India' বই এই ধারার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এছাড়াও নিম্নবর্গ চর্চায় কলম ধরেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র, ডেভিড হার্ডিম্যান, শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড আর্নল্ড প্রমুখ ইতিহাসবিদ ও সমাজবিদরা। তাঁরা সকলে মিলে নিম্নবর্গ বিদ্যার একটি তাত্ত্বিক দিক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাহীন, নিঃস্ব-রিক্ত, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা পর্যুদস্ত, মালিক শ্রেণির কাছে যারা নিছক উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র, কায়িক শ্রম যাদের একমাত্র অবলম্বন সেইসমস্ত পরনির্ভর ব্রাত্য শ্রেণিকেই নিম্নবর্গ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ শহরের শ্রমিকশ্রেণি, গ্রামাঞ্চলের কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি, নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরিব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। রণজিৎ গুহ অবশ্য এর পাশাপাশি নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, তুলনামূলক মাঝারি সম্পন্নগোছের কৃষক এবং ধনী কৃষককেও নিম্নবর্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন এই শেষোক্ত শ্রেণির ভূমিকা সবক্ষেত্রে স্পষ্ট নয় বরং দোটানার জটিলতায় পূর্ণ এমনকি বাস্তবিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এরা নিজেদের সামাজিক সত্তার পরিবর্তে উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে। বিপরীতে ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে ইংরেজ ও তাদের দেশি-বিদেশি কর্মচারী, শিল্পপতি, বণিক, খনির মালিক, ব্যবসায়ী, চা-বাগান জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণির মালিক, গ্রামের জমিদার, সামন্তপ্রভু, ভূমধ্যিকারী, কাঁচা টাকা উপার্জনকারী দালাল, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারী, যাজক, পরিব্রাজক প্রভৃতি শ্রেণিকে তিনি বলেছেন উচ্চবর্গ।[২] যারা উপরিউক্ত নিম্নবর্গের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে কিছু থাকতে পারে না বলেই মনে করে। যাদের আধিপত্যের ঘনঘটায় নিম্নবর্গের সংস্কৃতি, ভাবাদর্শ, এমনকি ধর্মীয় জীবনও আচ্ছন্ন। একথা ঠিক যে উচ্চবর্গের অস্তিত্বের সূত্র ধরেই নিম্নবর্গীয় ধারণার অবতারণা ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবজাত প্রতিটা ইতিহাসের পাতায় এই কথাটিকেই এযাবৎ সত্য হিসেবে মেনে ও মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস চলেছে অনবরত। তাই সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: "শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঐতিহাসিক মালমশলা স্বভাবতই রচিত ও রক্ষিত হয় উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই মালমশলার মধ্যে নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপটির আবির্ভাব ঘটে কদাচিৎ। অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।"[৩] কিন্তু নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত এই ধারণার বিরোধিতা করে নিম্নবর্গের নিজস্বতাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাঁরা দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন যে নিম্নবর্গীয় জনজাতির আচার-আচরণ, মতাদর্শ, সংস্কৃতি সর্বোপরি তাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক ধারাটিকে উচ্চবর্গের ভাবাদর্শের বাইরে রেখে আলাদাভাবে বিচার করা উচিৎ। এমনকি তাঁরা এও দাবি করেছেন যে ইংরেজ শাসনপর্বে যে জাতীয়তাবাদ বা নবজাগরণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, যাকে আপাত দৃষ্টিতে নিম্নবর্গীয় চেতনার আত্মপ্রকাশ বলে মনে হয়েছিল, সেই জাতীয়তাবাদ ও নবজাগরণও ছিল 'উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল'।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা হলো 'History from below' অর্থাৎ তল থেকে দেখার ইতিহাস। শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যেই নয়, বিভিন্ন সময়ে জাতিগত ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে চলেছে যারা এমনকি পুরষ শাসিত সমাজে বঞ্চিত মহিলারাও নিম্নবর্গ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা করতে হলে সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার তলদেশে যাদের অবস্থান, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে হবে। এ প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "ইতিহাসবিদ্যাকে ঢেলে সাজাতে হলে নিম্নবর্গের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং সব কিছুরই ওপরে রাজনীতিতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা কী ছিল তা নির্ণয় করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যেই নতুন তথ্য খুঁজতে ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে পড়তে হবে, দরকার হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরি করে নিতে হবে, আর এই সব কিছুকে সম্ভব করার জন্যেই তথ্যাশ্রিত অভ্যাসের

সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।”[৪]

রণজিৎ গুহ প্রদত্ত এই সূত্র বর্তমানে কেবল যে ইতিহাসবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেই আলোচিত হচ্ছে এমন নয় বরং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত গবেষণা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে এই চর্চা যেন ইদানীং বিশ্লেষণের এক অভিনব হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক, সমালোচক, লেখকরা নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অতীত ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থার মেরুদণ্ডে আঘাত হেনে তার স্বরূপকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা-বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁরা মনে করেন উচ্চবর্গের আধিপত্যের এই বীজ ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বেও ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে গ্রথিত ছিল। সংস্কৃত কাব্য, নাটক এমনকি মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্গের জয়গানই গাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গান্তরে সেখানে নিম্নবর্গের কথা উল্লেখিত হলেও তারা থেকে গেছে লেখকের হাতের পুতুল হয়ে এবং উচ্চবর্গের সামাজিক চাহিদা মেটানোর যন্ত্র হিসেবে। কারণ তখনকার দিনের লেখকেরা ছিলেন অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, যাঁরা রাজা বা উচ্চবর্গ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হতেন। ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্গ নির্ধারিত হতো অর্থের ভিত্তিতে, কিন্তু তার পূর্বে এই নির্ধারণ ছিল বর্ণভিত্তিক। চতুর্বর্ণের নিম্নে যাদের অবস্থান অর্থাৎ বৈশ ও শূদ্ররাই নিম্নবর্গ হিসেবে পরিগণিত হতো। তৎকালীন সাহিত্যে নির্দিষ্ট এক শ্রেণির প্রতি তুষ্টিকরণের এই রাজনীতির স্বরূপ নিম্নবর্গীয় সাহিত্য সমালোচকরা উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন।

হরিশংকর জলদাস বর্তমান শতকের একজন উন্নত মনস্ক কথাকার। ১৯৫৩ সালের ৩ মে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে এক জেলেপল্লিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে অদ্বৈত মল্লবর্মনের পর তিনিই দ্বিতীয় কৈবর্ত কলমচি যিনি জেলে-মালোদের জীবনগাথাকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তুলে ধরেন। হ্যাঁ তিনি জন্মগতভাবে কৈবর্ত সন্তান। শৈশব জীবন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন জাতিভেদ প্রথার কৃত্রিম নিগড়ে প্রান্তিক মানুষের দুর্দশার মূর্ত ছবি। তাই অনিবার্যত লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে জেলে জীবনের হীনমন্যতা থেকে লব্ধ এই বর্ণচেতনা। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে কৈর্বত জনজীবনের অভিব্যক্তি আলোড়িত ও মুখরিত হয়ে উঠেছে। এমনকি তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন’ বিষয়ে গবেষণাও করেছেন। নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রণের পাশাপাশি তিনি ‘মহাভারত’এর বেশকিছু চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস সাহিত্যে নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। যেমন, কর্ণ, সত্যবতী, একলব্য। আবার কিছু চরিত্রকে তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত দিক থেকে বিচার করে, তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেমন দুর্যোধন, শকুনি, ঘটোৎকচ প্রভৃতি। আমরা তাঁর ‘একলব্য’ উপন্যাসটি বিশ্লেষণের সূত্রে দেখার চেষ্টা করব তথাকথিত উচ্চবর্গের আধিপত্য এবং তার দাপটে নিম্নবর্গের জীবনযন্ত্রণার অভিঘাতটিকে। উপন্যাসটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অনার্যদের প্রতি আর্যদের প্রতারণার দৃশ্য। ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস ‘মহাভারত’এর কাহিনিধারার মধ্যে সুসজ্জিত বর্ণবাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন, সরব হয়েছেন তল থেকে দেখার মানসিকতা নিয়ে। তবে মহাভারতের পাশাপাশি ‘হরিবংশ পুরাণ’ থেকেও তিনি একলব্যের জীবনী অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে তার গুরুদক্ষিণা পরবর্তী জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি ‘হরিবংশ পুরাণ’ অবলম্বনেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একলব্যকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের অবমাননার চূড়ান্ত প্রতিফলন ‘মহাভারত’এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণার উদাহরণস্বরূপ একলব্য নামটি প্রায়শই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। ‘মহাভারত’এর একটি উপেক্ষিত চরিত্র হয়েও সে বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে ভক্তির সঙ্গে বিরাজ করছে। হয়তো উপেক্ষার কারণেই সে কিংবদন্তি। একলব্য নিষাদ (ব্যাধ) জাতির সন্তান, রাজা হিরণ্যধনুর পুত্র। সভ্য সমাজের বাইরে অরণ্যসংকুল পরিবেশে তাদের রাজ্যপাট। লেখক একলব্যের পিতামহ অনোমদর্শীর জবানিতে এই নিষাদ জাতির উৎস ও প্রান্তিকীকরণের একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, যে ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত আছে আর্যদের কুচক্রান্ত। ‘নিষীদ’ থেকে নিষাদ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বসে থাকা। অঙ্গ ও সুনীথা পুত্র বেণ ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাজা। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী রাজা বেণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে ঋষিদের প্ররোচনায় প্রজারা তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই সন্তানের পিতা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নিষীদ খর্বাকৃতি, হ্রস্বকায়। কনিষ্ঠজন অপূর্ব মনোহর ও দীর্ঘদেহী, নাম পৃথ্বী অর্থাৎ পৃথিবী। ঋষিরা

© Santiniketan Sahityapath

পৃথিবীর রাজা হিসেবে সুদর্শন পৃথ্বীকে মনোনীত করলেন। আর নিষীদকে তার অধার্মিক পিতার পাপের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে অপমান করলেন। তাকে বলা হলো অচল হয়ে বসে থাকা ছাড়া এই রাজ্যে তার কোনো কাজ নেই। শেষমেষ রাজ্য থেকেও তাকে বিতাড়িত করা হলো সুদূর বিন্ধ্যপর্বতের শৈলভূমিতে। নিষীদের প্রতি ঋষিদের এই অমানবিক আচরণ শুধুমাত্র তার রূপ ও আকৃতির জন্যই। কেননা আর্য সমাজ নিজেদের উন্নত দর্শন ও সভ্য বলে মনে করে। এই নিষীদই হলেন নিষাদগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ এবং তার নামানুসারেই এই গোষ্ঠীর নাম নিষাদ।

স্বজাতির এহেন অপবাদ ঘোচাতে ও খামতি মেটাতে একলব্য তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুরুকুলের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার। কিন্তু পুত্রের এইরূপ সিদ্ধান্তে পিতা হিরণ্যধনুর মনে উদ্বেগ ও শঙ্কা। তিনি জানেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য কখনোই একজন অনার্য ব্যাধ সন্তানকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন না। কেননা দ্রোণাচার্য স্বাজাত্যাভিমানী এবং ক্ষত্রিয় মদতপুষ্ট। তাই তিনি একলব্যকে সতর্ক করেছেন। নাছোড়বান্দা একলব্য তবুও তার পূর্বকৃত সিদ্ধান্তেই অটল থেকেছে। একদিকে অস্ত্রশিক্ষার প্রতি প্রবল স্পৃহা অন্যদিকে স্বজাতির সার্বিক উন্নয়ন তাকে আবেগায়িত করে তুলেছে। পিতামহ অনোমদর্শীও যে একেবারে শঙ্কাহীন তা নয়। যুগ যুগ ধরে অনার্যদের প্রতি হয়ে আসা আর্যদের প্রতারণার ধারাবাহিকতা ও মিথ্যাচারের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সচেতন: "... আর্যরা প্রথম থেকেই অনার্যদের ধ্বংস চেয়েছে। তারা অবিরত চেষ্টা করে গেছে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের পদানত করে রাখবার জন্য। তাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সংহিতায়, পুরাণে সর্বত্র কুৎসিতভাবে অনার্যদের রূপায়িত করেছে। তাদের কাছে অনার্যরা মানুষ নয়; তারা দানব, তারা অসুর। তারা সংস্কৃতিহীন।"[৫] অনার্যরা পৃথিবীর প্রাচীন জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বহিরাগত আর্যরা অপটু ও অনভিজ্ঞ এই জাতিকে অধিকারচ্যুত করেছে; তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে শস্য-শ্যামলা পৃথিবীর সমস্ত লিগেসি।

অনোমদর্শী 'রামায়ণ'এর প্রসঙ্গ টেনেও একলব্যকে বোঝাতে চেয়েছেন আর্য জাতির 'অহম উত্তম' মনোভাবটিকে। রামায়ণকার বাল্মীকি ছিলেন আর্যজাতির প্রতিনিধি। ক্রৌঞ্চি বিরহে শোকাহত হয়ে তাই তিনি সমগ্র ব্যাধজাতিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন — 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং... ' অর্থাৎ তোমরা কোনোকালেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবে না। কিন্তু পশুপাখি শিকার করা তো নিষাদজাতির আদিজীবিকা। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজারাও তো সমভিব্যাহারে শিকার করতে বনে-জঙ্গালে যান। তাহলে নিষাদরাই কেন অভিশপ্ত হবে, ক্ষত্রিয়রা কেন হবে না? বাল্মীকি মুনির অভিশাপ কি তাহলে বৈষম্যমূলক নয়? শুধু তাইই নয় তিনি আর্য রামকে ন্যায়পরায়ণ এক মহান মানব রূপে দেখালেন কিন্তু অনার্য রাবণকে আঁকলেন অসদাচারী রিরংসাপরায়ণ হিসেবে। কিন্তু অনোমদর্শী রামের মহত্ত্বে প্রশ্ন তুলেছেন, কেননা এই মহান রামই শূদ্র শম্বুক ও বালীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন, অপাপবিদ্ধা সীতাকে দু-দু'বার ত্যাগ করেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও অনোমদর্শী নাতি একলব্যকে সমর্থন ও উৎসাহিত করেছেন। কেননা তিনি জানেন একলব্যের মনস্কামনা যদি সফল হয়, তাহলে নিষাদ জাতি বর্বরতা মুক্ত হবে এবং যুদ্ধবিদ্যায় তারা পারদর্শী হয়ে উঠবে। মনের মধ্যে তাই হাজার সংশয় নিয়ে অবশেষে একলব্য পাড়ি দিয়েছে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে। তার এই যাত্রা নিরাভরণ ও একাকী। সে জানে সাধনা অর্জনে আভিজাত্য আড়ম্বরতার সৃষ্টি করে, গুরুর কাছে যেতে হয় সম্পূর্ণ খালি হাতে; মনের সমস্ত অস্মিতা ত্যাগ করে। যেতে যেতে একটা সময় সে পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর দেখা পায়, যে নদীকে ঘিরেও রয়েছে কুৎসাকারী আর্যদের রাজনীতি। নিষাদরাজ্যের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত বিনশন হলো সরস্বতী নদীর পরিণতি স্থল। দীর্ঘপথ অতিবাহিত হয়ে সরস্বতী একসময় এই বিনশনে এসে স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বল্প জলধারা আর ক্ষীয়মাণতার জন্য সে মিলিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতির এই স্বাভাবিক ঘটনাকে আর্যরা প্রচার করলেন অন্যভাবে: "ওরা বলল, পবিত্র নদী সরস্বতী নিষাদদের ঘৃণা করে। সরস্বতী ওদের স্পর্শকে এড়াবার জন্য বিনশনে থেমে গেল। নিষদরা যদি এর জল স্পর্শ করে, তবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই নিষাদের ছোঁয়া এড়াবার জন্য নিষাদরাজ্যের একটু আগেই সরস্বতী পৃথিবীর বিবরে প্রবেশ করেছে।"[৬] কারণ সরস্বতী তাদের প্রধান ও পবিত্রতম নদী। তাদের বেদে, পুরাণে এই নদীর অশেষ গুণগান করা হয়েছে; এই নদীকে নিয়ে তাদের অহংকারের শেষ নেয়। তাই নিষাদরাজ্যের প্রবেশমুখে সরস্বতীর স্তিমিতাবস্থাকে তারা দৈবী ইচ্ছা বলে ব্যাখ্যা করলেন শুধুমাত্র নিষাদদের অস্পৃশ্যতাকে জোরালোভাবে প্রমাণ করবার জন্য।

© Santiniketan Sahityapath

ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে অনোমদর্শীর মারফত বলিয়ে নিয়েছেন। উপর্যুপরি প্রশ্নবাণে আর্য সমাজের ভিতকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছেন। আর্যরা কোনো অর্থেই যে অনার্যদের থেকে উন্নত নয় তার একাধিক প্রমাণ তুলে ধরেছেন। বরং ব্যাধ রাজাদের চারিত্রিক ও পারিবারিক সৌকর্য ক্ষত্রিয় রাজাদের তুলনায় অনেক বেশি পরিশীলিত ও মার্জিত। অনোমদর্শীর বক্তব্যে সেই সত্যটি উঠে আসে: ‘‘ক্ষত্রিয় রাজাদের মতো ব্যাধরাজের ঘরে বহু নারী নেই। কোনো রক্ষিতা নেই। তেমন কোনো দাসী নেই, যাদের সঙ্গে রাজারা অবাধে সঙ্গম করেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা বলে কোনো ব্যাপার নেই। তাঁরা বহুগামী। যথেচ্ছাচারী। কোনো একজন নারীকে এককভাবে হৃদয়ে স্থান দেন না ক্ষত্রিয়রাজরা।’’[৭] তাছাড়া ব্যাধসমাজে বহুবিবাহ, পণপ্রথা, বিবাহবিচ্ছেদ এইসব অনৈতিকারও কোনো স্থান নেই। রাজা থেকে প্রজা সবার ঘরেই এক পত্নী। ক্ষত্রিয়দের মতো তারা ভূমি ও নারীর জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ করে না। তাহলে আর্যরা কীসের ভিত্তিতে নিজেদের সভ্য বলে জাহির করে? তার একটা সম্ভাব্য উত্তরও অনোমদর্শী দিয়েছেন — আসলে আর্যরা নৈতিকতার দিক থেকে উন্নত না হলেও বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যায় অনেক বেশি দক্ষ। আর এর জোরেই তারা ভারতে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠীর উপর অধিকার কায়েম করেছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য এইসব অনুন্নত নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে তারা পিলসুজের মতো ব্যবহার করেছে অথচ প্রতিদানে দিয়েছে শুধু অপমান আর অবহেলা।

লেখক দ্রোণাচার্যের জীবনকথাকেও সামনে এনেছেন, যা আলোচ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। কেননা তাঁর একটি ভুল সিদ্ধান্ত একলব্যের ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। একলব্য রাজপুত্র ও প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অক্ষত্রিয় নীচতার অজুহাতে দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি। জাতিবিদ্বেষী এই দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধেও রয়েছে লেখকের একাধিক প্রশ্ন। ভরদ্বাজ মুনির পুত্র দ্রোণ ব্রাহ্মণ হয়েও যজন-যাজন, শাস্ত্রানুশীলন, যজ্ঞ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। আশ্রমের অনাসক্ত জীবনযাপন, দৈন্যতা, ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন ক্ষত্রিয় রাজাদের মতো মর্যাদা ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হতে। তাই লেখকের চোখে দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছেন একজন লোভী ব্যক্তি। প্রতিজ্ঞা মতো দ্রুপদ তাঁর রাজ্যের অর্ধেকাংশ না দেওয়ায় দ্রোণের মনে প্রতিশোধস্পৃহা টগবগিয়ে উঠেছে। তাই দ্রুপদকে অবদমিত করতে তথা নিজের স্বার্থে তিনি কুরুবংশের ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় গুরুকুলে কুরু ও পাণ্ডব সন্তাদের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, তার মূলেও ছিল দ্রোণের একপাক্ষিক বাৎসল্যতা। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি নিজপুত্র অশ্বত্থমা ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। অন্যদিকে দুর্যোধনাদি শত ভাই ও কর্ণ ছিল তাঁর কাছে উপেক্ষার পাত্র। তিনি চাইলে গোড়াতেই এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারতেন যা অদূর ভবিষ্যতে ঘটমান রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে কমিয়ে দিতে পারত এবং ভরতবংশের অখণ্ডতাকেও ধরে রাখত। কিন্তু তিনি তা করলেন না বরং এই ভ্রাতৃবিরোধরূপ বিষবৃক্ষকে তিনি আরও স্ফীত করে তুললেন।

একজন প্রকৃত গুরুর কর্তব্য সকল শিক্ষার্থীদের সমান চোখে দেখা, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল উৎসাহী শিক্ষার্থীদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। কিন্তু আত্মাভিমানী দ্রোণাচার্যের মধ্যে এই গুরুসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়নি। লেখক দ্রোণাচার্য কর্তৃক একলব্যকে প্রত্যাখান করার দুটি কারণ দেখিয়েছেন: এক, তাঁর বর্ণবাদী গোঁড়ামি আর অন্যটি রাজনৈতিক। আর্যরা নিজেদের প্রাধান্যকে যুগান্তরব্যাপী বজায় রাখতে হিন্দু সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করলেন এবং এই চতুর্বর্ণের পেশাও নির্দিষ্ট করে দিলেন। আর এই পেশার ভিত্তিতে শূদ্রদের নিম্নবর্গ, অচ্ছুত বলে অভিহিত করে শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু তারা নিজেরা থাকলেন স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী হিসেবে। দ্রোণাচার্যের ভাবনায় এরূপ বর্ণ বিভাজনের আসল সত্যটি উঠে এসেছে:

‘‘ব্যাধ-ডোম-নিষাদদের মস্তিষ্ক বড় উর্বর। এই উর্বর মস্তিষ্কে যদি অস্ত্রবিদ্যা আর রণকৌশল ঢুকে যায় তাহলে পৃথিবীকে ওরা একদিন পদানত করে ছাড়বে। একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে তিনি ছোটজাতের এই নিষাদপুত্রকে প্রশ্রয় দিতে পারেন?’’[৮]

জাতিগত এই হীনমন্যতায় বিমর্ষ হয়ে প্রত্যাখ্যাত একলব্য জঙ্গলে প্রবেশ করলেও সে ভেঙে পড়েনি। তার জেদ, অভিমান রূপান্তরিত হয়েছে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তায়। সে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরি করে, তাঁকে মানসগুরু রূপে বরণ করে অস্ত্রবিদ্যা শুরু

© Santiniketan Sahityapath

করেছে। কিন্তু তাতেও তার নিষ্কৃতি নেই, তার অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শিতার খবর পেয়ে ঈর্ষান্বিত অর্জুন আর কূটকৌশলী দ্রোণাচার্য উভয়ে মিলে গুরুদক্ষিণার ছলনায় তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিলেন। এক অনার্য সন্তানের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, বড়ো ধনুর্ধর হওয়ার বাসনাকে তাঁরা গলা টিপে হত্যা করে দিতে চেয়েছেন। কেননা একলব্যের উত্থান তাদের জাতির পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। দ্রোণাচার্যের চিন্তায় ভয়ের সেই ছাপ লক্ষ করা যায়: "যে করেই হোক জংলি নিষাদটাকে থামাতে হবে। নইলে একলব্যের সঙ্গে সঙ্গে ওই বর্বর ব্যাধরাও একদা অস্ত্রনিপুণ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর দখল নিতে চাইবে তারা। তখন কোথায় যাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, ক্ষত্রিয় জৌলুস আর বিপুল সুখৈশ্বর্য!"[৯]

লেখক হরিশংকর জলদাস এর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, যে দ্রোণাচার্য একলব্যকে নিজের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন না, তিনি কোন অধিকারে একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা নিতে পারেন? তাছাড়া ছোটো জাতের শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে যাঁর ব্রাহ্মণত্বে আঘাত লাগে, সেই ছোটো জাতের কাছে দক্ষিণা চাইতে তাঁর অশৌচবোধ হলো না! আসলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাদের এরূপ অপকর্মগুলিকে স্বধর্ম পালনের নাম করে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন — যেমন রামায়ণে তেমনি মহাভারতেও। একলব্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বুদ্ধদেব বসুও ঠিক এই কথায় বলেছেন: "... গুরুর এই ঘাতকতুল্য আচরণে 'অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন' হলেন অর্জুন — কেননা দ্রোণ তাকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি হবেন সব যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে 'ধর্ম' টেকে না। ধর্মকে এ-রকম আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা — সেটাও অর্জুনের স্বভাবেরই অঙ্গ, সেটাও তাঁর স্বকর্মসাধনের পক্ষে প্রয়োজন... "[১০] অর্থাৎ আর্যরা নিজেদের জাতির সম্মান রক্ষার্থে বিবেককে নয়, যুক্তিকে নয়, মানবিকতাকে নয় বরং গীতা ব্যাখ্যাত স্বকর্ম ও রাজধর্মকেই শ্রেয় বলে গ্রাহ্য করে।

উপন্যাসের প্রথম দিকে ঔপন্যাসিক নিজের বক্তব্যগুলিকে যেমন অনোমদর্শীর মুখে প্রতিস্থাপন করেছেন, শেষার্ধে তেমনি কর্ণ ও একলব্যকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দিয়েছেন। একলব্যের বিপন্নাবস্থায় একমাত্র কর্ণই তার দোসর হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। কেননা সূতপুত্র হওয়ার দরুন কর্ণকেও সারাজীবন একলব্যের মতো বয়ে বেড়াতে হয়েছে বঞ্চনার গ্লানি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কূটবুদ্ধি কীভাবে সহজ-সরল নিম্নবর্ণের মানুষদের ভবিষ্যতকে নিঃশেষ করে দেয় সে সম্পর্কে কর্ণ খুব ভালোভাবেই অবগত। তাঁরা কখনো নিম্নবর্গের সামাজিক উত্তরণ সহ্য করতে পারে না। তাই কর্ণ একলব্যকে নিষেধ করেছে গুরুদক্ষিণা দিতে। এমনকি এই ঘটনার পরমুহূর্তে সে দ্রোণাচার্য ও অর্জুনের কাছে একলব্যের হয়ে একাধিক সওয়াল জারি করেছে; সে অভিশাপ দিয়েছে গুরু দ্রোণকে এহেন অন্যায়াচরণের জন্য: "এমন একদিন আসবে সেদিন এই অসহায় একলব্যের মতো আপনি নিরুপায় ভঙ্গিতে বসে থাকবেন। একলব্যের বুড়ো আঙুলের মতো আপনার শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে নিয়ে যাবে।"[১১] একলব্যের কঠিন পরিস্থিতিতে কর্ণই তাকে পুনরায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। আবার নতুন করে নিজেকে তৈরি হতে বলেছে। কেননা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের হাজার প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিম্নবর্গের মানুষরা মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে — কর্ণ নিজেই তার প্রমাণ।

এটা সত্য যে বুড়ো আঙুলের অভাবে একলব্য আর আগের মতো তীর নিক্ষেপ করতে পারবে না, কিন্তু এত সহজে হারতেও সে নারাজ। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে অর্জুন আর দ্রোণাচার্যের উপর। সে দ্রোণাচার্যকে আর গুরু বলে মানতে পারছে না, যিনি তার আজন্ম লালিত বাসনাকে নিমেষে হত্যা করেছেন। তাই তার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। সে মনে মনে দ্রোণাচার্যকে তিরস্কার করেছে: "তুমি আমার গুরু নও, তুমি আমার আদর্শ নও। তুমি লোভী, তুমি স্বার্থপর। তুমি পক্ষপাতী। তুমি পাষণ্ড। তুমি হত্যাকারী। তুমি হত্যা করেছ আমার আজন্মলালিত বাসনাকে। তুমি দস্যুর মতো আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছ আমায়।"[১২]

অতীতে যে দ্রোণাচার্য দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে কৃপাপ্রার্থী হয়ে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন, সেই তিনিই কিনা আজ নিজেকে উঁচুবর্ণের গুরু বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। আসলে জাতিবিদ্বেষের মোহে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তাই সে দ্রোণাচার্যের মূর্তি ভেঙে ফেলেছে, সংকল্প করেছে দ্রোণের মতো গুরু ছাড়াও শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হওয়ার: "এই জগৎসংসারকে আমি দেখিয়ে যেতে চাই — একলব্য নামে একদা এক নিষাদপুত্র ছিল। যে হেলায় জাতপাতের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল ডিঙিয়ে, উচ্চবর্ণের অবহেলা-অপমানকে পাত্তা না

© Santiniketan Sahityapath

দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল।”[১৩] একলব্যের এই প্রতিজ্ঞা যেন সমগ্র নিম্নবর্গীয় শ্রেণির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। বর্ণপ্রথার বেড়াজাল ডিঙিয়ে তারা নিজেদের সামাজিক অস্তিত্বকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। উচ্চবর্গ প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, সামাজিক অনুশাসনে আর তারা আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়।

একলব্য সারাজীবন ধরে স্বজাতির উন্নতিকল্পে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিল। এই জাতিগত উদ্দীপনায় তাড়িত হয়ে কঠোর সহিষ্ণুতা ও অভ্যাসের দ্বারা সে আবার এক দক্ষ যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল, কোনরকম প্রতিকূলতাই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তাকে দেখা গেছে বীরের মতো লড়াই করতে। কিন্তু এই যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে সে একটু দ্বিধায় পড়েছিল। কেননা তার শত্রু ছিল দু’জন ব্যক্তি — অর্জুন ও দ্রোণাচার্য। তাঁদের একজন ছিলেন যথাক্রমে পাণ্ডবকুলে অন্যজন কৌরবদলে। অবশেষে প্রতিশোধ পূরণ ও ঋণশোধের বাসনায় কর্ণের আহ্বানে সে কৌরবদলেই যোগ দিয়েছিল। সে জানত তার বুড়ো আঙুল কেটে নেওয়ার পিছনে অর্জুনই ছিল সিংহভাগ দায়ী। ঈর্ষাপরায়ণ অর্জুনই নিজের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার তকমা ধরে রাখতে দ্রোণাচার্যকে প্ররোচিত করেছিল। তাই তার সমস্ত রাগ অর্জুনের উপর, অর্জুনই তার প্রধান শত্রু। সম্মুখ যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করার নেশাতে পেয়ে বসল তাকে: “পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যায় পেয়ে বসেছে তাকে। কখনো তীরাঘাতে, কখনো গদাঘাতে, কখনো বা অসি চালিয়ে শত্রুসৈন্য নিধন করে গেল সে। তার মনে হলো — সে নাম না জানা পাণ্ডবসৈন্যকে হত্যা করছে না, হত্যা করছে এক একজন অর্জুনকে।”[১৪] কুরুক্ষেত্রের শেষদিন পর্যন্ত সে অবিরত উন্মাদের মতো যুদ্ধ করে গেছে। আঠারোতম দিনে বন্ধু কর্ণের মৃত্যু ঘটলে মর্মাহত একলব্য সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু তারপরও তার জীবনের অস্থিরতা কাটেনি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও অর্জুনকে বধ করতে না পারার ব্যর্থতা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কেবলমাত্র কুচক্রী কৃষ্ণের ছলনায় অর্জুন অভেদ্য থেকে গেল এবং কুরুকুলের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে উঠল। এই কৃষ্ণই হলো যত নষ্টের মূল, এই পৃথিবীকে সে অকৃষ্ণ করে ছাড়বে। কৃষ্ণ বধের বাসনায় সে সৈন্য জোগাড় করল, বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে আকস্মিকভাবে দ্বারকা আক্রমণ করে বসল। কিন্তু এই যুদ্ধেও সে পরাজিত হলো। কৃষ্ণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, গিয়ে উঠল এক নামহীন নির্জন দ্বীপে। ক্লান্ত, বঞ্চিত, প্রতাড়িত, ক্ষুব্ধ, বিজিত একলব্য সেই নির্জন দ্বীপে বেঁচে রইল প্রতিশোধের জ্বালা বুকে নিয়ে। লেখক বলেছেন: “ক্রূর তঞ্চকতা, সতীর্থের প্রবঞ্চণার জ্বালা বুকে নিয়ে একলব্য অপেক্ষা করতে থাকল সেই ভবিষ্যতের জন্য, যে ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত আর শোষিত হবে না, শাসিত হবে জাতবর্ণ নির্বিশেষে প্রাকৃত মানুষ দ্বারা।”[১৫]

একলব্যের এই প্রতিহিংসা সমাজের উঁচুবর্ণের প্রতি যারা সুদীর্ঘকাল ধরে সামাজিক অনুশাসনের নাগপাশে নিম্নবর্ণের মানুষদের দমিয়ে রেখেছে। তার জীবনব্যাপী এই লড়াই সেই ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয়তন্ত্রের মতবাদকে ভেঙে ফেলার লড়াই। সে বিজিত একথা ঠিক কিন্তু লেখকের চোখে তার বড়ো পরিচয় সে একজন লড়াকু যোদ্ধা। আর্যদের সেই স্বৈরশাসনের যুগে তার মতো এমন বিরোধী মনোভাব আর কোন অনার্য চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

আগেই বলা হয়েছে যে নিম্নবর্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে সমাজের নিম্নদেশ থেকে ভাবতে হবে। ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস সমাজের তল থেকে ভাবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই একলব্য চরিত্রটিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নিজের জীবনদর্শন দিয়ে তিনি একলব্যকে চিনতে এবং চেনাতে চেয়েছেন। তথাকথিত উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে অনোমদর্শী, কর্ণ এবং সর্বোপরি একলব্যের মধ্যে যে প্রতিবাদী স্বর ধ্বনিত হয়েছে, তা মূলত লেখকেরই জীবনজিজ্ঞাসা। একলব্য চরিত্রের এত নিখুঁত বিশ্লেষণ ‘মহাভারত’ কিংবা ‘হরিবংশ পুরাণ’এ পাওয়া যায় না। ‘হরিবংশ পুরাণ’ মতে কৃষ্ণের হাতে একলব্য নিহত হয়েছিল, কিন্ত ঔপন্যাসিক নিম্নবর্গের পরাজয়কে মানতে পারলেন না। তাই তিনি একলব্যকে বাঁচিয়ে রাখলেন; বাঁচিয়ে রাখলেন তার মধ্য দিয়ে সমগ্র নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতকে।

© Santiniketan Sahityapath

তথসূত্র:

১। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ ‘ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস’, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ, ফেব্রুআরি ২০২২, পৃ. ৪
২। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, রণজিৎ গুহ, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ওই, পৃ. ৩২-৩৩
৩। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ ‘ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস’, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ওই, পৃ. ৮
৪। ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, রণজিৎ গুহ, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ওই, পৃ. ৩২
৫। ‘একলব্য’, হরিশংকর জলদাস, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০২২, পৃ. ১৩
৬। ওই, পৃ. ৩০-৩১
৭। ওই, পৃ. ২৪
৮। ওই, পৃ. ১০০
৯। ওই, পৃ. ১৪০
১০। ‘মহাভারতের কথা’, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১২৫-১২৬
১১। ‘একলব্য’, হরিশংকর জলদাস, ওই, পৃ. ১৪৮
১২। ওই, পৃ. ১৫২
১৩। ওই, পৃ. ১৫৭
১৪। ওই, পৃ. ১৬৯
১৫। ওই, পৃ. ১৯৬

আকর গ্রন্থ :

১। একলব্য’, হরিশংকর জলদাস, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ :

১। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদক, ‘বুদ্ধিজীবীর নোটবই’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, অগস্ট ২০২১
২। রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭৭)’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২৮ শে নভেম্বর ২০০৫
৩। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ, ফেব্রুআরি ২০২২
৪। জহর সেনমজুমদার, ‘নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন’

—

© Santiniketan Sahityapath